ভালো ছবি নিজেইতো একটা মিউজিক

এবারে গায়ক ও চিত্রশিল্পী মুখোমুখি। **শ্রীকান্ত আচার্য্য**-র সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত**। ছবি নিয়ে এক গায়কের অনুভূতি ...।

শ্রীকান্তদা ,তুমি গায়ক হিসেবে সর্বজন পরিচিত এটা আমরা জানি। কিন্তু ছবির প্রতি তোমার যে একটা দুর্বার ভালোবাসা আছে এটা অনেকেই জানেন না। ছবির প্রতি তোমার এই টান বা ভালোবাসার শুরু কবে থেকে?

ছবি আঁকার ব্যাপারটার প্রতি টান ছোটবেলাতে স্কুলে থাকতেই আমি বুঝতে পারি। আমি যখন খুব ছোট, থ্রি বা ফোরে কিংবা সিক্সে পড়ি তখন স্কুলে কোনও ওয়াল ম্যাগাজিন হলে ছবি আঁকার দায়িত্ব এসে পড়ত আমার ওপরেই। সেগুলো সবই হত ইলাস্ট্রেশনধর্মী কাজ। এরকম কাজ বেশ কয়েকবার করেছি স্কুলে। সেইভাবে যদি আমাকে বলো, তাহলে আমি বলব ছবি আঁকার ব্যাপারটার প্রতি আমার ভালোলাগার শুরু হয় সহজপাঠের থেকে। ছোটবেলায় যে সহজপাঠ পড়তাম তার ইলাস্ট্রেশনগুলো ছিল নন্দলাল বসুর করা। সাদাকালো ছবি আমাকে বরাবরই দারুনভাবে আকর্ষণ করে। সেই টানের বীজটা হয়তো সহজপাঠের পৃষ্ঠাতেই লুকিয়ে আছে। তাছাড়া ছোটোবেলাতে অনেক সময় অনেক বই উপহার পেয়েছি স্কুলের প্রাইজ হিসেবে। যেমন, অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী, তার মধ্যে ছিল সত্যজিৎ রায়ের ইলাস্ট্রেশন। আমি একটা ক্ষীরের পুতুল পেয়েছিলাম, তার ভেতরেও ছিল যতদূর মনে হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের ছবি। তারপরে সত্যজিৎ রায়ের বই যখন পড়তে আরম্ভ করি – মনে পড়ছে সোনার কেল্লা ছিল আমার কেনা সত্যজিৎ রায়ের প্রথম বই – তার ভেতরেও যে সব ছবিগুলো ছিল সেগুলো আমাকে ভীষণ টানত। সেইজন্যই কিনা জানি না আমার লাইন ড্রইং-এর প্রতি খুব নেশা জন্মে যায়।

তুমি কি সেইসব ইলাস্ট্রেশন দেখে নিজেও ছবি আঁকতে খাতার পাতায়?

হ্যাঁ, সেটা তো হতই। সত্যজিৎ রায়ের ইলাস্ট্রেশন খুব ভালো লাগত, এখনও লাগে। আমি ছোটবেলায় থাকতাম দক্ষিণ কলকাতায় লেক গার্ডেন্সে। সে সময় প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের অসম্ভব রকমের একটা সখ্যতা ছিল। মানে এ-ওর বাড়িতে গিয়ে অনেকটা সময় কাটাচ্ছি, যেন আমরা সবাই একটাই পরিবারের মতো। আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই একটি পরিবার ছিল যেখানে আমার থেকে বয়েসে বড় এক দাদা ছিলেন, যাকে আমি অশোকদা বলতাম। পুরো নাম অশোক বসু। সে-ও কোনোদিন ছবি আঁকা শেখেনি। কিন্তু সে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে ছবি আঁকত। অশোকদা কি রকম ছবি আঁকত সেটা আমি তোমাকে বলছি। অশোকদা সাধারণত বাড়িতে বসে জানলা দিয়ে হয়তো উল্টোদিকের বাড়ির একটা অংশ দেখা যাচ্ছে, একটা ইলেকট্রিকের পোল, একটা তার চলে গেছে, সেটার ওপর একটা কাক বসে আছে বা একটা কাটা ঘুড়ি লটকে দোল খাচ্ছে সেই তারে – সেই জাতীয় দৃশ্য আঁকতেন দেখে দেখে। ওগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগত। অশোকদাকে নকল করে আমিও কিছুটা সময় ছবি আঁকতে আরম্ভ করি। চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে ছবি আঁকার কলম কিনে আনি। একটা তো এমন সময় ছিল যে আমি ছবি এঁকে একটার পর একটা কাগজ ভরিয়ে ফেলতাম।

তুমি তখন ঠিক কত বড়?

আমি তখন ক্লাশ ফোর কিংবা ফাইভে পড়ি। ওই রকম ছবি আমি খুব আঁকতাম। এবং পরেও আমি দেখেছি সাদাকালো লাইন ড্রয়িং আমার বরাবরই প্রথম পছন্দের বিষয় হয়ে গেছে। যদিও রঙের ছবি যে আমি ভালোবাসি না তা কখনওই বলা যাবে না। কিন্তু লাইন ড্রয়িং যেন সবার আগে। যেন তার কোন বিকল্প নেই। একটু আগে সত্যজিৎ রায়ের কথা বলছিলাম। তাঁর তো বিভিন্ন ধরণের ইলাস্ট্রেশন আছে। মানে লাইনটাকে উনি নানারকমভাবে ব্যবহার

করেছেন। সোনার কেল্লায় যে স্টাইলের ছবি আঁকা, বাদশাহী আংটিতে কিন্তু সেভাবে আঁকা নয়। আবার গ্যাংটকে গন্ডোগোলের স্টাইলটা একবারে আলাদা। এই যে বিভিন্নভাবে লাইনকে ব্যবহার করা, কখনও একটা বা দুটো স্ট্রোকে আঁকছেন, কখনও অনেকগুলো স্ট্রোক পাশাপাশি দিয়ে একটা ঘন বুনোট করছেন – এই ব্যাপারটা আমার দারুণ লাগে।

উনি তো সলিড কালারেও অপূর্ব কাজ করতেন, যেমন সোনার কেল্লার ছবিগুলো।

হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছ। ওই যে ছবিতে উনি স্পেস ছেড়ে রাখতেন সেটা আমার অসম্ভব ভালো লাগে। স্পেসটাকে একদম ছেড়ে রেখে আলোকে উনি যেভাবে ধরতেন সেটাও একটা দুর্দান্ত ব্যাপার। আবার কখনও কখনও এমন অ্যাঙ্গেল আছে ছবিতে যেগুলো একেবারে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল। যেমন, বাদশাহী আংটিতে এমন কিছু ছবি আছে ...

যেমন বেনারসের ঘাটের দৃশ্য।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদম। কী অদ্ভুত সুন্দর! আর কী ডিটেল। বেনারসের ঘাটের যে ছবিটার কথা তুমি বললে সেখানে তুমি দেখবে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটা প্রভাব আছে।

ঠিক বলেছ। তাছাড়া সত্যজিৎ রায় তো বিনোদবিহারীর প্রত্যক্ষ ছাত্রও ছিলেন।

ঠিক। এই ছবি দেখলেই বোঝা যায় উনি বিনোদবিহারীর হাতে গড়া একজন শিল্পী।

আচ্ছা, শ্রীকান্তদা তুমি যে ছোটবেলার নিজের ছবি আঁকার কথা বলছ, তুমি কি কারো কাছে ছবি আঁকা শিখেছ কখনও?

না না। আমি কোনওদিন আঁকার ক্লাশে ভর্তি হইনি। যা এঁকেছি নিজে নিজেই এঁকেছি।

এই আঁকার চর্চাটা কতদিন ছিল? কলেজে উঠেও কি ছবি এঁকেছ?

না অতদিন হয়নি। ক্লাশ এইট, নাইন পর্যন্ত হবে। তারপর আমি আর কখনও সিরিয়াসলি ছবি আঁকিনি। যদিও মনে হয়েছে আঁকলে হয়। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে মনে হয়েছে অনেক চর্চার প্রয়োজন। আর অভ্যেস না থাকলেও তো এই জিনিসটা হয় না অত সহজে।

ছোটবেলার কথা থেকে এবার আমরা যদি তোমার বর্তমান জীবনে আসি। এখন গানই তোমার জীবন। পেশায় তুমি সংগীত-শিল্পী আর নেশায় চিত্রপ্রেমিক। এই দুটো ব্যাপারকে একসঙ্গে একত্রে নিয়ে তুমি কিভাবে উপভোগ করো?

আসলে কোনও জিনিসটাই তো আমি কখনও খুব ভালোভাবে করতে পারিনি। জীবনের বেশিরভাগ কাজই ভালোভাবে করা হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ, নিজের মন যে মানটাকে চায় সেই মানটা নিজেই কোনওদিন ছুঁতে পারিনি। সেটা গানের ক্ষেত্রেও হয়নি, আর ছবি আঁকা তো ছেড়েই দিলাম। যেহেতু আমি জীবনের কোনও কাজই গাঢ় কোনও অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে করিনি তাই ছবি আঁকাটাও হয়নি। কারণ, সে জিনিস করতে গেলে শিখতে হয়, ভাবনা চিন্তা করতে হয়, তার পিছনে অনেক সময় দিতে হয়, অনুশীলন লাগে। কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারি, ছবি আঁকার প্রতি আমার ভালোবাসাটা রয়ে গেছে। সেটা কীভাবে বুঝি জানো? আমি যখনই কোনো সফরে গিয়েছি কোথাও যদি ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছি সেই সুযোগ আমি ছাড়িনি। সেটা কলকাতাই হোক অথবা বিদেশ।

ছবির প্রতি তোমার এই টানের কথা আমরা খুব ভালোভাবে জানি।

ভালো ছবি প্রদর্শনীর খবর শুনলেই আমি সেখানে যাই। গানের অনুষ্ঠান করতে যাবার সুবাদে বিদেশেও বেশ কয়েকবার আমি গিয়েছি। বিদেশে গিয়েও যেখানে ভালো ছবি দেখার জায়গা আছে সেখানে আমি হানা দিয়েছি। যেমন ২০১২-তে আমরা ইওরোপে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন ফ্রান্সেও গিয়েছিলাম। প্যারিস তো ছবির স্বর্গরাজ্য, বুঝতেই পারছ। প্যারিসে আমরা তিনদিন ছিলাম। প্যারিসের মতো একটা জায়গা – যা কিনা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অন্তত দুমাস সময় লাগে, অতটা সময়তো ছিল না। প্যারিস, আহা! সেখানে তুমি যেদিকেই তাকাবে কিছু না কিছু শিল্পের দেখা পাবে। তারই মধ্যে আমি গিয়েছিলাম Musee d'Orsay-এ। সেখানে অন্তত ঘন্টা পাঁচেক ছিলাম। এতবড় একটা মিউজিয়াম সেটা ভালোভাবে দেখতে গেলে এই সময়টা কিন্তু কিছুই না।

সুতরাং আমাকে দেখার জিনিস বেছে নিতে হয়েছিল। আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হল ইম্প্রেসানিজম-এর পিরিয়ডটা। Musee d'Orsay-এ ইম্প্রেসানিস্ট শিল্পীদের মধ্যে কে নেই? সবাই রয়েছেন। সে সব দেখা একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সেখানে রয়েছেন ভ্যান গঘ, মনে, সেজান। এঁদের করা সেই সব কাজের মাঝে তুমি তো নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। যদিও আমার প্রিয় শিল্পী ভ্যান গঘের কাজ দেখার মূল জায়গাটা হল আমস্টারডম, সেখানে যাবার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু d'Orsay-তেও যেটা আছে একটা ফ্লোরে সেখানে শুধুই

সেজান, মনে আর ভ্যান গঘ। সেসব দেখতে একটা সময় আমি বুঝতে পারলাম যে আমার শরীরটা খারাপ লাগতে আরম্ভ করেছে।

মানে, এতটাই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলে!

একদম। একটা সময়ের পর আমি বুঝতে পারলাম আমার হাত পা মাথা অবশ হয়ে যাচ্ছে। মানে অত ভালোজিনিস একসঙ্গে একনাগাড়ে অতক্ষণ ধরে নেওয়া যায় না। আমি অন্তত অভ্যস্ত নই। Musee d'Orsay দেখার অভিজ্ঞতাটা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। এরও পাশাপাশি বলতে হবে লন্ডনের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি দেখার কথা। সেটা অবশ্য আরো তিন-চার বছর আগেকার ঘটনা। লন্ডন ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিও কিন্তু বিরাট এবং তাকে ভালোভাবে দেখতে গেলে অন্তত সাত-দশদিন সময় লাগবে। আমি সেখানে রেমব্রান্ট, টার্নার দেখেছি কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি গিয়ে নিজেকে সঁপে দিলাম সেই ইম্প্রেসানিস্ট পিরিয়ডে। এবং সেখানেও মনে, ভ্যান গঘ, সেজান, দেগা – সব মিলিয়ে পাগল হয়ে যাবার মতোই অবস্থা।

আর এর বাইরেও আর একজনের কাজ আমার অসম্ভব ভালো লেগেছিল; তিনি হলেন কানালেটো। তাঁর আঁকা অসাধারণ কিছু অয়েল পেন্টিং আছে ওখানে। ভেনিসে একটা নৌকো প্রতিযোগিতা হয়, তাকে বিষয় করে একটা সিরিজ আছে

কানালেটোর। সেটাও অসাধারণ, যাকে বলে একেবারে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো কাজ। ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারির পাশেই ছিল ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারি। এটাও আমরা যথাসম্ভব খুঁটিয়ে দেখেছিলাম। অসামান্য সব কাজ আছে এখানেও। এই তিনটে মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারি দেখার অভিজ্ঞতা আছে আমার। লন্ডনের টেট গ্যালারির কথাও তো বলতে ভুলে গেলাম। আসলে কাকে ছেড়ে কার কথা বলব? ওয়াশিংটনের কিছু মিউজিয়াম ও গ্যালারিতে সালভাদর দালির মতো কিছু বরণীয় শিল্পীর কাজ আমি দেখেছি। যদিও দালির ও তার পরবর্তীদের কাজ বুঝতে গেলে আরো অনেক বেশি অনুশীলনের দরকার অন্তত আমার পক্ষে।

তুমি অনেক শিল্পীদের কথাই তো বললে। তবু যদি তোমাকে প্রিয় দু-তিনজন শিল্পীর নাম বেছে নিতে বলি, তুমি কাদের কথা বলবে?

আমি কজনের ছবিই বা দেখেছি বল। তবু যা দেখেছি তাদের মধ্যে ভ্যান গঘ আর সেজানের নাম বলব সবার আগে। ওঃ, কী অসামান্য এই দুজন শিল্পী!

আর আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে?

আমি পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের শিল্পীদের কথা যদি বলি তাহলে বলব নন্দলাল বসু, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা। বিশেষ করে বিনোদবিহারীর কাজের মধ্যে আমি অদ্ভুত একটা ম্যাজিক খুঁজে পাই। কিছুদিন আগেই আবার 'ইনার আই' ফিল্মটা দেখলাম জানো। মাস দুয়েক আগে শান্তিনিকেতনে গিয়েও আবার আমি বিনোদবিহারীর মিউরাল পেন্টিংগুলো অনেক সময় নিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। এটা আমি প্ল্যান করেই রেখেছিলাম যে কাজগুলো ভালো করে দেখব। ওনার ছবি ও ভাবনাচিন্তার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যার কোনও তুলনা হয় না।

একেবারে এই সময়ের শিল্পীদের মধ্যে কারা তোমার খুব প্রিয়?

এই মুহূর্তের চিত্রশিল্পীদের কাজের খবর আমি কতটুকুই বা রাখি। তবে হ্যাঁ, বিকাশ ভট্টাচার্য আমার ভীষণ প্রিয়। তিনি হলেন এমন একজন শিল্পী যাঁর কাজের মধ্যে অসম্ভব একটা শক্তি ছিল। যে শক্তির খানিকটা আমি সনাতন দিন্দার কাজের মধ্যে দেখি। বিকাশের ছবি দেখলে বুকে এসে ধাক্কা মারার মতো একটা ব্যাপার হয়। এছাড়া আমার খুব ভালো লাগে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ। আরেকজনের কাজও আমার বেশ পছন্দ, তিনি হলেন গোপাল ঘোষ। আমার তো আবার ল্যান্ডস্কেপ জাতীয় ছবির প্রতি টানটা একটু বেশি। গোপাল ঘোষের ল্যান্ডস্কেপও আমার অসাধারণ লাগে। যদিও তিনি একেবারে এই মুহূর্তের শিল্পী নন।

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। তুমি তো একজন সংগীতশিল্পী। আমরা জানি গানের ভেতরে, বিশেষ করে সুরের ভেতরে একটা চিত্রকল্প লুকিয়ে থাকে। তুমি নিজে একজন গায়ক হিসেবে যখন গান গাও তখন তুমি এটাকে কীভাবে দ্যাখো? তুমি কি মনে মনে ছবি আঁকো?

কোনও কোনও ক্ষেত্রে তো এটা খুবই হয়। আমি যখন গান গাই তখন আমি তো কথা ও সুর দুয়েরই সাহায্য নিচ্ছি, কিছু কিছু গানের ক্ষেত্রে দেখেছি এই দুটো জিনিসের কেমিস্ট্রি মনের ভেতরে ছবি আঁকতে সাহায্য করে। গান গাইতে গিয়ে তুমি যদি একটা ছবি দেখতে পাও তাহলে সেটা তোমার মডুলেশনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করবে। মডুলেশন বলতে আমি বলতে চাইছি, ধরো তুমি একটা কথা জোরে বললে, পরের কথাটা কতটা আস্তে বলবে, সেই স্বরের ওঠানামাটা – সুরের ওঠানামা নয় – কিন্তু ছবিটাকে অনুসরণ করে হতে থাকে। আমি যে ছবিটাকে মনের ভেতর দেখছি সেটার ভেতরে কোনও একটা বিবরণ থাকতে পারে, সংলাপ থাকতে পারে। সবই কিন্তু ছবি হতে পারে, হয়ে উঠতে পারে।

তার মানে গানের ভেতর দিয়ে কোথাও একটা ছবিকে খোঁজা?

আসল ব্যাপারটা হল সেই ছবিটাকে যদি নিজের মনের ভেতর ঠিক মতো আঁকতে পারা যায়, তাহলে কিন্তু সেই ছবিটা তোমার কাছে যা যা চাইবে সেইভাবেই তুমি গানটা গাইবে। আশাকরি বিষয়টা বোঝাতে পারলাম?

আচ্ছা শ্রীকান্তদা, ধর তুমি যদি ছবি আঁকতে, তাহলে কি তুমি মিউজিক্যাল-পেন্টিংই আঁকতে?

না, তাহলে আমি হয়তো অন্যকিছু আঁকতাম। আমি হয়তো নেচারের ওপর কাজ করতাম। প্রকৃতি আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি দেখেছি যে ছবিতে প্রকৃতি থাকে সেই ছবি আমার অজান্তেই আমাকে একটু বেশি টানে। এই প্রসঙ্গে বলি আমি অনেক জায়গায় দেখেছি গান ও ছবি আঁকাটাকে অনেক সময় পাশাপাশি আনা হচ্ছে, কিন্তু সেটা প্রায় সময়েই সফল হয় না। আসলে গান আর ছবি আঁকার ইন্টারপ্রিটেশনটা এত বেশি পার্সোনাল, এতটাই ব্যক্তিগত যে সেটা সবসময় পাঁচজনের সঙ্গে শেয়ার করা যায় না। আমি যখন একটা ছবিকে ক্যানভাসে ধরছি তখন তো তাকে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে দিচ্ছি। একটা রাগ শুনে আমার মনের ভাবনাটা কখনও একটা ছবির সঙ্গে মিলতে পারে, আবার কখনও না-ও মিলতে পারে।

মানে তুমি বলছ ছবিটাকে ছবি হিসেবে আলাদাভাবে সার্থক করে তোলার কথা। সেটা সাংগীতিক ছবি হোক কিংবা না হোক।

একদম তাই। ছবির প্রেরণা যাই হোক না কেন, ছবিকে হতে হবে ছবি। ভালো ছবি নিজেইতো একটা মিউজিক তৈরি করতে পারে। এরকম উদাহরণ ভুরি ভুরি আছে।

তুমি তো অনেক দেশ, শহর, প্রদেশ ঘুরেছ। অনেক জায়গায় ছবি দেখেছ, ছবির দর্শকদের দেখেছ। বাঙালি দর্শকদের অবস্থানটা তোমার কাছে ঠিক কী রকম? ক্রিকেট, সিনেমা, গানের তুলনায় ছবির প্রতি তাদের আকর্ষণের জায়গাটাকে তুমি কি চোখে দেখো?

না, সত্যিই এ ব্যাপারে আমি খুব হতাশ। বাঙালির বেশিরভাগটাই খুব সুপারফিশিয়াল, হাল্কা। আমি তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি। লন্ডনের ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারিতে আমি দুবার গিয়েছি। ২০০৫-এ প্রথমবার, শেষবার ২০১২-তে। দুবারই আমি দেখেছি সেখানে বেশ কয়েকটি স্কুলের বাচ্চাদের নিয়ে আসা হয়েছে। ধরো একটা সেকশনে ঢুকলাম ভ্যান গঘ আর মনের ছবি রয়েছে সে জায়গায়। আর সেখানে যে সব বাচ্চাদের নিয়ে আসা হয়েছে তারা সব ওয়ান-টুয়ের ছাত্রছাত্রী। একসঙ্গে হয়তো পঞ্চাশটা বাচ্চা। সঙ্গে তাদের দু-একজন শিক্ষক এসেছেন, তাঁরা বাচ্চাদের সেইসব দেখাচ্ছেন এবং বোঝাচ্ছেন। এইভাবে বাচ্চাগুলো খুব অল্পবয়স থেকেই ওইসব ছবিগুলোর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, অভ্যস্ত হচ্ছে। আমি একটা জিনিস জানতে চাই, আমাদের এখানে কোনও স্কুলের বাচ্চাদের কি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের একজিবিশন দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়? আসলে আমরা একজিবিশন করতে যতটা ব্যস্ত, দেখানোর জন্য ততটা তৎপর নই।

তুমি বলতে চাইছ ছবি দেখতে শেখার কথা।

ঠিক। আমি বলতে চাই আগে ছবি দেখে আনন্দ পেতে শিখতে হবে, গান শুনে আনন্দ পেতে শিখতে হবে। তারপরে তো ছবি আঁকবে, গান করবে। যে কোনও আর্ট ফর্মকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে শেখার ব্যাপারটায় আমাদের দেশ বহু লক্ষ যোজন পিছিয়ে আছে উন্নত দেশগুলোর তুলনায়। এ বিষয়ে তর্ক করে কোনও লাভ নেই।

নিঃসন্দেহে।

এদেশে দেখতে শেখার মানসিকতাই নেই আসলে। এখানে সবাই সব কিছু জানে। মানে মাতৃগর্ভ থেকেই সবাই সমস্ত কিছু জেনে বুঝে বসে আছে।

আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় কলকাতা বা আশপাশে ছবির বিষয়ে মানুষের সচেতনতা আগের থেকে কিছুটা হলেও বেড়েছে। অন্তত তোমার ছোটবেলা থেকে আজ অবধি যতটুকু যা দেখেছ তার বিচারে?

না। কোনও লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। আর্টের ব্যাপারে আমাদের সমঝদারি থাকলে আমাদের এই কলকাতা শহরটা খুব ভালো জায়গায় থাকত। শহরের অনেক জায়গায় অনেক কদর্য মূর্তি বসানো আছে সেগুলো অন্তত দুবেলা আমাদের দেখতে হতো না। তৃতীয় শ্রেণীর সব কাজ রাস্তার তিনমাথা, চারমাথার মোড়ে ঘটা করে বসানো আছে। সেই দিক থেকে আমি অন্তত বলব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ইদানিং কিছু ভালো কাজ হচ্ছে। মানে, কিছু ক্রিয়েটিভ কাজ দেখা যাচ্ছে। যদিও এর আবার অন্য একটা দিকও আছে, সেটা আমি আলোচনায় আনছি না এখন। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আর্টের যে একটা এক্সারসাইজ চলছে – এটা কিন্তু একটা দারুণ ঘটনা।

তুমি থিমপুজোর বিষয়ে খানিকটা আশাবাদী?

যদিও একটা পুজো বা উৎসব অল্প কয়েকদিনের ব্যাপার। শুধু এটা দিয়ে তো চলবে না। এমনিতেই আমাদের শহরটা খুব কদর্য অবস্থায় আছে। একটা ভালো ছবি বা ভাস্কর্য রাখার জন্যও তো উপযুক্ত জায়গা চাই। সুলভ শৌচালয়ের ওপরতো একটা দারুণ ছবি বা মূর্তি রেখে লাভ নেই কোনও। আমাদের গোটা শহরটাইতো সুলভ শৌচালয়। এইরকম পরিবেশে ভালো কাজের কদর হওয়া অন্তত পাবলিক প্লেসে খুব কঠিন।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তুমি কি বলবে এই বিষয়ে?

বাংলাদেশে কিন্তু দারুণ কিছু চিত্রকর আছেন। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে আমি ওখানে কিছু ছবি দেখেছি, কী সব অসামান্য কাজ। যদিও আমি সব শিল্পীদের নাম এখানে আলাদা করে উল্লেখ করতে পারছি না।

সেখানে দর্শকরা কি আর একটু বেশি সচেতন আমাদের এখানকার চাইতে?

আমি এ বিষয়ে অতটা ভালোভাবে বলতে পারবো না। কারণ, খুব বেশি খুঁটিয়ে তো দেখা হয়নি। তবে আমার নিজের যেটা মনে হয় সেটা হল বাংলাদেশে ছবির চর্চাটা অনেক বেশি সিরিয়াসলি করা হয়। তাদের একটা শিল্পতৃষ্ণা আছে। পৃষ্ঠপোষকতাও আছে।

তাহলে, এদেশের ছবিচর্চা বিষয়ে খানিকটা মন খারাপ নিয়েই আজ আমাদের আড্ডা শেষ করতে হচ্ছে।

আসলে এই মন খারাপের জায়গাটা কখনওই পুরোপুরি যাবে না। এটা থাকবে। সবসময় তোমাকে মন ভালো করার লড়াইটা করে যেতে হবে। এটা নিজেদেরই করতে হবে। এই লড়াইয়ে তুমি কখনওই লক্ষ লক্ষ লোককে পাশে পাবে না।

- প্রথম ছবিটি প্যারিসের Musee d'Orsay-র; দ্বিতীয় ছবিটি ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, লন্ডনের; তৃতীয় ছবিটির শিল্পী কানালেটো এবং চতুর্থ ছবিটির শিল্পী পল সেজান।